একজন শিক্ষকের দৃষ্টিতে রাষ্ট্র ও রাজনীতি

এদেশেরই এক জনপ্রিয় প্রয়াত শিল্পীর একটা গান এরকম: 'আমি ছন্দহারা এক নদীর মতো ছুটে যায়, আমার চলার শেষ কোন সাগরে তার ঠিকানা তো জানা নাই।' গানের আরেকটা লাইনও না বলে পারছি না, 'সীমাহারা দূর দিগন্ত পারে, জানিনা কোথা ভেসে যায় কোন সে অভিসারে, যারে খুঁজে ফিরি আমি তারে যে...।' এবার একটা গল্প বলি: বেশ আগের কথা। তখন দেশে লেখাপড়া শিখতে হতো, কেউ পাশ করিয়ে দিত না, শিখে পাশ করতে হতো। রাজনৈতিক মস্তানরাও কথায় কথায় রামদা, কিরিচ হাতে করে হেডমাস্টারের পিণ্ডি চটকাতে আসতো না। শিক্ষকদের, বিশেষ করে হেডমাস্টারদের মেরুদণ্ড বেশ শক্ত ছিল। কোনো রাজনৈতিক পক্ষপাতিত্ব সমাজে চলতো না। মানুষের জিব ঘুরাতে হলে জাগ্রত বিবেকের একটা দংশন ছিল। সমাজে জনপ্রতিনিধিদের কথায় সাধারণ মানুষের আস্থা ছিল। সমাজে নীতিবোধের প্রাধান্য ছিল। এক হেডমাস্টার স্কুলের বারান্দায় বসে অজু করছেন। এক ছাত্র মাথা চুলকাতে চুলকাতে সামনে এসে দাঁড়াল। হেডমাস্টার ছেলেটাকে দেখে চিনে ফেলেছেন। ছেলেটা ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার আগে টেস্ট-পরীক্ষায় 'ডিজ্যালাউড' হয়েছে। ছাত্রটা এসে শিক্ষককে ভদ্রতার সাথে জিজ্ঞেস করল, 'স্যার, আমি টেস্টে আনএলাউ হলাম কেন?' হেডমাস্টার কোনো কথা না বাড়িয়ে সরাসরি উত্তর দিলেন, 'ঐ জন্যই, যাও।' ছেলেটা হেডমাস্টারের উত্তরটা বুঝতে না পেরে আবার একই প্রশ্ন করলো। হেডমাস্টারও একই উত্তর দিয়ে নামাজের উদ্দেশ্যে অফিস রুমে ঢুকে পড়লেন।

হবে হবে করে বায়ান্নটা বছর পার করে ফেললাম। এদেশে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠায় আমরা বারবার 'আনএলাউ' হচ্ছি কেন? সারাদিন যত কাজই করি না কেন, মাথা থেকে ভাবনাটা যায় না। স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় চৌদ্দ-পনেরো বছরের কিশোর ছিলাম। তেমন বেশি কিছু বুঝতাম না। শ্লোগানে অংশ নিয়ে শ্লোগান হাঁকতে পারতাম। বর্তমানে যে কোনো সময় জীবনসূর্য অস্ত যাবে। মাঝখানে পেশায় মাস্টারসাহেব হয়েছি। এখন নিজের জীবনে কি পেলাম, কি পেলাম না– তা ভাবি কম। ভাবি, আমাদের সন্তানদের ও ছাত্রছাত্রীদের জন্য আমরা কেমন বাংলাদেশ রেখে যাচ্ছি! তারা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে? তারা যা দেখে, তাই শেখে। সর্বৈব মিথ্যাচার, শঠতা, ঠগবাজি, প্রকাশ্য চাটুকারিতা, ব্যক্তি ও গোষ্ঠী স্বার্থান্ধতা ছাড়া শেখার এদেশে আর কি আছে! এদেশে সামাজিক শিক্ষা বলতে কি কিছু আছে? স্বাধীন-সার্বভৌম এ ভূখন্ডটা মানুষের মতো মানুষদের জন্য স্বর্গ, না-কি নরকতুল্য? আরো কত কিছু দুর্ভাবনা মাথার মধ্যে অবিরাম ঘুরপাক খায়। নিজেকে স্থির রাখতে পারিনে বলেই হয়তো এসব কথা প্রকাশ করি। আমরাও তো এদেশের নাগরিক। দেশটা তো আমাদের সবার। কেউ দেখি দুচোখ দিয়ে, কেউবা এক চোখে দেখি।

স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র ঘাটলে কয়েকটা কথা আজও চোখে ভাসে: বাংলাদেশের জনগণের জন্য সাম্য; মানবিক মর্যাদা; সামাজিক ন্যায়বিচার; এবং সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্র। মাঝেমধ্যেই রাতে বালিশে মাথা রেখে আকাশপাতাল চারণ করি। বায়ান্নটা বছরেও আমরা এগুলোর একটাও অর্জন করতে পেরেছি কি? কাউকে জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে হয়: আমাদের ঠিকানা কোথায়? আমরা এভাবে 'আনএলাউ' হলাম কেন? এসব ভেবেই হয়তো কেউ কেউ অবৈধভাবে টাকা লুটপাট করে সুখের আশায় অন্য দেশে টাকা পাচার করছে। কেউবা যোগ্যতা অর্জন করতে না পেরে অবৈধভাবে বিদেশ যেতে সাগর পাড়ি দিতে গিয়ে ভূমধ্যসাগরে ডুবে মরাকেও শ্রেয় মনে করছে। দেশটা কি এতই খারাপ! আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের সেই স্বদেশী মূল্যবোধ, আত্মজিজ্ঞাসা, ত্যাগের মহিমা কোথায় হারালো? আমাদের মানবতাবোধ বলতে কি কিছুই আর অবশিষ্ট আছে? একজন ব্যক্তি যতক্ষণ পর্যন্ত আমার অন্যায় কাজে

সমর্থন দেয়, ততক্ষণ সে ধোয়া তুলসীপাতা। যেই-না আমার অন্যায় কাজের বিরোধিতা করে, তখনই তার মতো খারাপ লোক আর এ পৃথিবীতে একটিও নেই। এ আবার কেমন বিবেকবোধ? আমরা মনুষ্যত্ববোধের এ আবার কোন অবনতির দিকে ধেয়ে চলেছি! কেন চলেছি?

শিক্ষক হয়েছি বলে সরকারি-বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ, হাইস্কুলের অসংখ্য সহকর্মীর সাথে আমার সখ্য। শিক্ষামানের যে শোচনীয় অবস্থার কথা আমি জানি, তাদের কাছে আরো বেশি শুনি। এদেশের শিক্ষার মান যে কোন পর্যায়ে নেমে গেছে, সংশ্লিষ্টমহল ছাড়া কাউকে বলে বোঝানো যাবে না। একজন কলেজশিক্ষক বললেন, 'ভাই, এইচএসসি পরীক্ষার মাত্র দশ-পনেরোটা খাতার লেখা স্যাম্পল হিসেবে দেখলেই বুঝবেন, এদেশে লেখাপড়া বলতে কিছু হয় না। তবু চাকরি টিকিয়ে রাখতে আমরা নম্বর দিই, পাশ করাই। বাস্তব কথাটা কোথাও বলতে পারি না, দোষ নিজের গায়ে এসে পড়ে।' আমিও বুঝি, সম্মিলিত প্রচেষ্টা ছাড়া কোনো একক ব্যক্তির চেষ্টা এক্ষেত্রে বৃথা। সম্মিলিত প্রচেষ্টা যারা দেখাবেন, তারা রাজনীতি(?) নিয়ে মহাব্যস্ত। শিক্ষার উন্নয়নে হাজার হাজার কোটি টাকার প্রজেক্ট নিচ্ছি। বাস্তবে শিক্ষামানের উন্নতি না দেখা পর্যন্ত কথায় বিশ্বাস করিনে। কত সহকর্মীর কাছেই তো একই কথা শুনছি, স্বচোক্ষে দেখছি। কী করতে পারছি! একটা দেশের শিক্ষা ধ্বংস হয়ে গেলে জাতি ধ্বংস হতে আর কী বাকি থাকে? অথচ মনে মনে তা হয়ে চলেছে।

আরেকটা হলো দুর্নীতির অবস্থা। একটা জাতি ধ্বংসের জন্য এ দুটো উপাদানের পতনই যথেষ্ঠ। তাহলে আমরা কিসের এত বড়াই করি? একটা স্বাধীন ভূখণ্ডের অস্তিত্ব ছাড়া আমাদের আর অস্তিত্ব কোথায়? আমরা মানুষ, না মানুষ নামের কলঙ্ক? পত্রিকা খুললেই দুর্নীতি, পুকুর চুরি, নদী চুরি– এমন কি সাগর চুরিও চোখে পড়ছে। এতে মনে কোনো রেখাপাতও করে না। চুরি-দুর্নীতি, ব্যাংক ডাকাতি, খুনাখুনি সাধারণ সহনশীলতার পর্যায়ে চলে এসেছে। কাকে বলব? কে শোনে কার কথা? আইনের শাসন কই? পরিবেশ-পরিস্থিতি ক্রমশই নিম্নগামী হচ্ছে। কারণ আমরা মনুষ্যত্বের বৈশিষ্ট্য ও আত্মজিজ্ঞাসা হারিয়েছি। নীতিবান মানুষ যে-দেশে হারিকেন ধরিয়ে খুঁজতে হয়। একেবারে প্রতিটা সেক্টরে, প্রতিটা কাজে যেখানে দুর্নীতি 'অওপেন সিক্রেট' ব্যাপার হয়ে গেছে, কেউ এর প্রতিবিধান নিয়ে কোনো কথাও আর বলে না। ভালোমানুষ কিছু থাকলে তারা আর ধর্তব্যের মধ্যে পড়ে না। মূল্যবোধসম্পন্ন মানুষ তো হঠাৎ করে এক রাতে তৈরি হবে না! এমনটি হলে সে-দেশ কেমন চলা উচিত?

শিক্ষা মানুষের মনুষ্যত্ববোধ জাগিয়ে তোলে। মনুষ্যত্ববোধ-জাগানিয়া শিক্ষা কোথায়? চিন্তাভাবনা, কথা ও আচার-আচরণের মধ্যে তো মানুষের মনুষ্যত্ব থাকতে হবে, তারপর কর্মে তা প্রকাশ পাবে। আমরা মনুষ্যত্ববোধের জাগরণ না শিখিয়ে বাহ্যিক লৌকিকতা ও লোক-দেখানো সৌজন্য শেখাতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছি। তাই 'আনএলাউ' হয়ে গেছি।

দেশের রাজনীতিতে পুরো বিপরীতমুখী দুটি ধারার জেদাজেদি শুরু হয়ে গেছে। যে যা-ই করুক চরম ভোগান্তিটা সাধারণ মানুষের জন্য। বিরোধী পক্ষেরও জেল-জুলুম-নির্যাতন কম নয়। প্রতিটা ভাত-খাওয়া মানুষের কোনটা সত্য, কোনটা মিথ্যা, যৌক্তিক-অযৌক্তিক এ বোধটুকু অন্তত আছে, আমাদের নেতারা এটা ভুলে যান। আমরা নিকট অতীতে নিজেই মানুষের আস্থা নষ্ট করেছি, তাই যত ভালো নির্বাচনের প্রতিশ্রুতিই দিই না কেন, আমাদের কথায় কেউ আস্থা রাখতে পারছে না। এ দোষের দায় অন্যের উপর চাপায় কী করে? কয়েকমাস আগে তুরস্কে জাতীয় নির্বাচন হয়ে গেল। সেখানে সরকারি দলে থেকে এরদোয়ান শতকরা ৪৯.৪৯ ভাগ ভোট পেয়েও ৫০ ভাগের বেশি পাওয়ার জন্য পুনর্নির্বাচন দিতে হলো। এ থেকে আমাদের রাজনৈতিক দলগুলোর অনেক শিক্ষণীয় ছিল। আমরা ভালো কিছু শিখতেও চাইনে, আবার চর্চাও করিনে। শুধু জোর করে নিজেদের অপকর্ম সাধারণ

মানুষের ওপর চাপিয়ে দিই, আর বলি, 'আমি যা করি তা তোমরা কোরো না, আমি যা বলি তা তোমরা শোন।' আমাদের স্বভাব ও কর্মের পরিবর্তন না হলে শুধু মুখ দিয়ে ঠেলে দেশকে বেশিদূর নিয়ে যাওয়া যাবে না। আমরা বিভিন্ন যুক্তি দেখিয়ে যত চাতুর্যপূর্ণ বয়ানই করি না কেন, সাধারণ মানুষ সবই বোঝে; আমরা ঠিকানা ভুলে যাচ্ছি। অনেকবারই পত্রিকায় পড়েছি, কোনো ব্যক্তি প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করতে নিজের ছেলে বা মেয়েকে হত্যা করে প্রতিপক্ষের উপর দায় চাপিয়ে দিয়ে মামলা করে। আমাদের দলীয় স্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠে দেশের স্বার্থকে প্রাধান্য দিতে হবে। দলীয় স্বার্থ উদ্ধারের জন্য দেশটাকে সন্ত্রাসীরাষ্ট্র বা জঙ্গীবাদী রাষ্ট্রের তকমা গায়ে লেপন করাটা ভুল হবে। এটাকে আমাদের গ্রাম্য ভাষায় 'নিজের নাক কেটে পরের যাত্রাভঙ্গ করা' বলে। এদেশের নিত্য বিবদমান দলগুলো অতীতে নিজেদের মর্যাদা রেখে নিজেরা সমস্যা সমাধান করেছে, এমন নজির কম। সবাই বারবারই বিদেশীদের কাছে আমাদের একই অভ্যন্তরীণ সমস্যাকে মেটানোর জন্য সত্য-মিথ্যা মিলিয়ে দেশের বিরুদ্ধে নালিশ করেছে। আমরা কেউই ধোয়া তুলসীপাতা মূলত নই।

রাষ্ট্রের মালিক যদি জনগণই হয়ে থাকে, আবার জনগণের মতামতকেই যদি প্রাধান্য দিই, তাহলে জাতীয় নির্বচনে 'দলনিরপেক্ষ বা নির্দলীয়' সরকার ব্যবস্থার মতামত জানার জন্য নির্দলীয় কারো অধীনে আমরা একটা গণভোটেরও তো আয়োজন করতে পারি। তবে জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য দুই-তিন মাসের নির্দলীয় সরকার ব্যবস্থার আয়োজন যতই করি না কেন, পাঁচ বছর পর একই সমস্যা যে আবার মাথাচাঁড়া দিয়ে উঠবে না, তার নিশ্চয়তা কোথায়? এজন্যই বলি গণভোট যদি করতেই হয়, সংবিধান পরিবর্তনের জন্যও গণভোটের কাজ একবারে চুকিয়ে ফেলা দরকার। অতপর নির্দলীয় সরকার আইন, বিচার ও নির্বাহী বিভাগে যত পরিবর্তন আনা প্রয়োজন, সুষ্ঠুভাবে দেশ পরিচালনা করার জন্য আইনের যথাযথ সুষ্ঠু-নিরপেক্ষ প্রয়োগ করে দেশটাকে বাঞ্ছিত পথে আনবে, আইনের শাসন নিশ্চিত করবে। তারপর জাতীয় নির্বাচনের মাধ্যমে আবার রাজনীতিবিদদের হাতে তুলে দেবে। আমাদের রাজনীতিবিদদের কথা বিশ্বাস করা কষ্টকর। আমাদের রাজনৈতিক ব্যবস্থা পরিবর্তন করা বাধ্যতামূলক হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ বিষয়ে আমার অনেক পরামর্শও আছে। আমার ভাষাটা শুনতে যত খারাপই লাগুক, দেশটা এভাবে বিকৃত মানসিকতাসম্পন্ন রাজনীতিবিদদের হাতে ছেড়ে দিয়ে খেলার পুতুল বানানো কোনোভাবেই সমীচীন নয়: বর্তমান ব্যবস্থায় দেশ ভালোভাবে চলা ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আমি কোনো আশার আলো দেখি না। এদেশের রাজনীতির প্রতিটা অঙ্গে যে পচন ধরেছে, তা সহজ টোটকা চিকিৎসায় রোগ নিরাময় হবার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। যে যা-ই বলুক, কোনো আপ্তসার বচনের ওপর আমার আস্থা নেই। আমাকে নৈরাশ্যবাদী বলে গালি দিলেও বলার কিছু নেই। কারণ মানুষকে অমানুষ, দুর্নীতিবাজ, স্বার্থপর ও অশিক্ষিত বানিয়ে শুধু গলাবাজিতে চিঁড়ে ভেজে না। ফলত আমরা এদেশে সাধারণ সবাই কয়েদি হয়ে গেছি। এ জনগোষ্ঠীকে সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিক সুশিক্ষা দিয়ে সুশিক্ষিত বানানো ও দেশে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা না করা পর্যন্ত জাতির সামনে কোনো ভবিষ্যত নেই।

এমন কোনো পক্ষ, দল বা নাগরিকসমাজ যদি পারে, বিপরীতমুখী দুটো পক্ষকে যে ভাবেই হোক আলোচনার টেবিলে বসতে বাধ্য করুক। তাদেরকেই সমাধানে আসতে হবে। এর কোনো বিকল্প আমি দেখি না। উভয় পক্ষ একে অন্যের প্রতি যতই কাদা ছোঁড়াছুঁড়ি করে আসর মাতানোর চেষ্টা করুক না কেন, এবারের নির্বাচন বিগত নির্বাচনের মতো জোড়াতালি দিয়ে হবে না। দেশের অর্থনৈতিক অবস্থাও ভালো না। পশ্চিমা গণতান্ত্রিক শক্তি ও পার্শ্ববর্তী ভারতীয় শক্তি যতই সাহস যোগাক না কেন, শেষ দায়টা এদেশকেই বহন করতে হবে। এভাবে চললে জোর করে একদলীয় নির্বাচন করতে পারুক, বা না পারুক সামাজিক বিশৃঙ্খলা, সাধারণ মানুষের ভোগান্তি

কোনোক্রমেই কমবে না। উভয়েরই এই শুভবুদ্ধির উদয় যত তাড়াতাড়ি হয়, ততই সাধারণ মানুষের মুক্তি, দেশেরও মঙ্গল। যুবক বয়সে সিনেমা দেখতে যেতাম। একটা সিনেমায় সকল কয়েদিকে কয়েদি-পোষাক পরে বৃত্তাকারে বসে থালা বাজিয়ে গান গাইতে দেখেছিলাম, 'এই জেলখানাকে নেবো আপন করে, ও বন্ধু রে, এখানে সবাই কয়েদি।' যদি কেউ প্রশ্ন করে, "স্যার, আমি 'আনএলাউ' হলাম কেন?" উত্তর হবে, 'ঐ জন্যই'।

(৫ সেপ্টেম্বর ২০২৩, দৈনিক যুগান্তর উপসম্পাদকীয় কলামে প্রকাশিত)

ড. হাসনান আহমেদ– অধ্যাপক, ইউআইইউ; গবেষক ও শিক্ষাবিদ; প্রেসিডেন্ট, জাতীয় শিক্ষা-সেবা পরিষদ।